পঞ্চম অধ্যায়

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস : মধ্যবিত্তের সাতকাহন

বিশ্ব পুঁজিবাদ ও যন্ত্রসভ্যতার ক্রমোন্নতির ফলে চলমান জীবনের দ্রুত পরিবর্তন উচ্চ, মধ্য এবং নিম্নবিত্ত সীমারেখাকে যেন আমূল বদলে দিয়েছে। ফলে ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিকে মধ্যবিত্ত জীবনের যে পরিসর তা যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যে-কারণে উচ্চ-মধ্য এবং নিম্ন -মধ্য মিলিয়ে দু'শো টাকার ভাড়াটে, চাকরিজীবী মানুষ থেকে লক্ষ টাকার চাকরিজীবী কিংবা লক্ষ লক্ষ টাকার আয়কারী ব্যবসায়ী পর্যন্ত এই মধ্যবিত্তের আওতাধীন। মধ্যবিত্তের সংজ্ঞাটাই পাল্টে গেছে সম্পূর্ণটা। যদিও আমরা রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে স্বাধীনতা পরবর্তী নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জীবন চরিত্রকে খুঁজে পাই। মনে হয় বড়ো চিনি ওকে। আমাদের মতোই। তাঁর প্রথম দিকের কয়েকটি উপন্যাসের পটভূমি, মানুষজন পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের। এর কারণ হিসেবে লেখক উল্লেখ করেছেন—

> ''আসলে কলেজে পড়ার সময় এবং কলেজ ছেড়ে বেরোনোর পর আমি মাঝে মাঝে রাঁচী, হাজারিবাগ, পালামৌ অঞ্চলে গিয়ে দীর্ঘদিন থাকতাম। কয়লাখনি অঞ্চল এবং আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল।''[১]

সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' (১৯৫৪), 'অন্বেষণ' (১৯৫৬), 'অরণ্য আদিম' (১৯৫৭), 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' (১৯৫৭) প্রভৃতি। এই সময়ের উপন্যাসগুলোয় লেখকের ব্যক্তিজীবনের (প্রথম প্রহর) পাশাপাশি চোখে দেখা অতি সাধারণ নিম্নবিত্তের জীবন চরিত্রই যেন উপন্যাসগুলোর ক্ষেত্রে প্রধান জায়গা দখল করেছে। লেখক প্রতিনিয়ত যেন তাঁর একটি নিজস্ব পরিসর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বিষয়বস্তু, ভাষা, আঙ্গিক এমনকী চরিত্র নিয়েও যেন তিনি নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন। এভাবে লিখতে লিখতে হঠাৎই যেন তাঁর বিষয় বৈচিত্র্যের ঘোর কেটে গেল। কেননা এদের প্রত্যেককেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অনেক দূর থেকে। ফলে নীচুতলার চাষী, কয়লাখনির শ্রমিক, সাঁওতাল, মুণ্ডার জীবন

নিয়ে কল্পনায় ভর করে গল্প নির্মাণ করেছেন যা পাঠকদের প্রচুর প্রশংসাও অর্জন করেছে। তাই লেখকের কেবলই মনে হতে লাগল—

> ‘‘ঐসব চরিত্ররা সত্যিই ঐ রকম? ... হ্যাঁ, আমি তখন নিজের দিকে চোখ ফেরালাম। নিজেকে চেনার চেষ্টা করলাম। আমার চারপাশে প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব সহকর্মী অর্থাৎ গোটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজটাকেই দেখতে শুরু করলাম। তাদের ঈর্ষা লোভ সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি ভাল থাকতে না পারার বেদনা, হেরে যাওয়া, জিতে যাওয়া—এসবই চোখে পড়লো। তাই দূর থেকে দেখা জিনিস কল্পনায় সাজিয়ে আর লিখতে ইচ্ছে করলো না। আমার যেটুকু কল্পনাশক্তি তা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের অন্দরমহলে ঢুকে পড়লো।’’[২]

স্বভাবতই ‘অ্যালবামে কয়েকটি ছবি’ উপন্যাস পর্যন্ত তাঁর ভাবনায় যে বাস্তব এবং রোমান্টিকতার মিশেল তৈরি হয়েছিল ‘খারিজ’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর এই ভাবনার যেন আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনে তিনি যেন একান্তই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন। এই সময় থেকেই তাঁর লেখার জগত আরও পরিণত এবং গভীর ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। ফলে মধ্যবিত্ত জীবনের বহুস্বর এর পরবর্তী উপন্যাসগুলোর পরতে পরতে খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য এই অধ্যায়ে মূলত এই পর্বের পাঁচটি উপন্যাসের যথাক্রমে ‘খারিজ’, ‘লজ্জা’, ‘হৃদয়’, ‘বীজ’, ‘বাহিরি’-র জীবন চরিত্র নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

।।এক।।

‘খারিজ’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়দীপ। জয়দীপের আত্মকথনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও উপন্যাসের অন্যান্য সহযোগী চরিত্র হিসেবে জয়দীপের স্ত্রী অদিতি, ছেলে টুকাই, গৃহভৃত্য পালান, পালানের বুড়ো বাবা হারান মণ্ডল, বাড়িওয়ালা নটবর রায়, ডাক্তার

বাগচি, প্রতিবেশী অখিলবাবু, নিশীথবাবু, অ্যাডভোকেট পরমেশ্বরবাবু, শ্যামলী, সহকর্মী রাধানাথ, ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ, প্রতিবেশী মিলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জয়দীপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী। নটবর রায়ের বাড়িতে দু'শো টাকার ভাড়াটে। স্ত্রী অদিতি এবং একমাত্র সন্তান টুকাইকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। এবার টুকাইয়ের দেখাশোনা এবং অদিতির নিত্যনৈমিত্তিক কাজের জন্য প্রয়োজন হয় এক বালক ভৃত্যের, আবির্ভাব ঘটে পালানের। পালানের আকস্মিক মৃত্যুতে ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে চলে জয়দীপের আত্মকথনে। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র কথক জয়দীপের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের স্ববিরোধিতা, পলায়ন প্রবণতা তথা দ্বান্দ্বিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন কথাকার রমাপদ চৌধুরী। পালানের মৃত্যু তাই জয়দীপকে ভাবিয়ে তোলে নানাভাবে। থানা-পুলিশ, আইন, পাড়া-প্রতিবেশীর মন্তব্য সবকিছু জয়দীপকে বিমূঢ় করে তোলে। স্বভাবতই কোনো উপায় না থেকে বাড়িওয়ালা নটবর রায়কে ভরসার একমাত্র কেন্দ্রস্থল হিসেবে জয়দীপ আঁকড়ে ধরে। এখানে জয়দীপের স্বগতোক্তি মধ্যবিত্তের অসহায়তাকে ফুটিয়ে তোলে—

> ''যাকে আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় স্রেফ নটবর বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতাম, তাকেই আমি একান্ত ভরসার স্থল মনে করে আঁকড়ে ধরতে চাইলাম।''[৩]

এই অসহায়বোধ থেকেই দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতা দেখা দেয়, আর এখানে নিজের আচরণ সম্পর্কে জয়দীপ সন্দিহান। তার মনে হয় আগাগোড়াই সে যেন অভিনয় করছে। পালানের প্রতি মমতাবশত তাকে সোয়েটার কিনে দেওয়ার কথা ভাবলেও পালানের মৃত্যুতে সেই সামান্য মমতাটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। যদি থাকত তাহলে কেন প্রথমেই দরজাটা ভেঙে ফেলেনি? আসলে মধ্যবিত্তের প্রতিভূ জয়দীপ নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল, অর্থাৎ পালান থেকেও তার কাছে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে সাক্ষী জোগাড় করা জরুরি হয়ে ওঠে। কেননা অন্যের ব্যাপারে যতই জ্ঞান দেওয়া যাক না কেন, যখন তা নিজের কাঁধে এসে পড়ে তখন রীতিমতই মধ্যবিত্ত শ্রেণিবোধ হকচকিয়ে যায় জয়দীপের, সেজন্যই ছোটো থেকে বড়ো সবাইকে তোয়াজ করতে থাকে—

> ''এটা যদি আমার নিজের ব্যাপার না হতো, যদি অন্য কারো

বাড়ি দেখানোর ব্যাপার হতো, তা হলে, ঐ স্ট্রেচারবহনকারী লোক দুটিকে আমি নির্ঘাত বলতাম 'আও'। 'আইয়ে' বলে নিশ্চয়ই তোয়াজ করতাম না।"[৪]

মধ্যবিত্ত মানুষ সবসময় সচেতন থাকে বিশ্বের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার সম্পর্কে অথচ নিজের সংসারের বেলায় একেবারে অন্ধ। কনকনে শীতের রাতে পুরোনো শতরঞ্জির মতো পাতলা তোষক পেতে ছেঁড়া চাঁদর গায়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে শুতে দেওয়ার অপরাধবোধ থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে শ্রেণিগত বৈষম্য। তাই জয়দীপের মনে হয় —

"শীত কি সকলের কাছে একরকম নাকি। ওরা পাড়াগাঁয়ে এরচেয়ে অনেক বেশি কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত। হোক নোংরা, হোক না পুরোনো, চাদর কিংবা কম্বল কি গরীবদের জোটে নাকি।"[৫]

তাই পালানের মৃত্যুতে তার অশিক্ষিত বুড়ো বাবাকে দায়ী করতেও শিক্ষিত জয়দীপের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না। জয়দীপ মনে করে তার তো একটা বাচ্চা চাকরের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পালানের বাবাই তো আসলে দায়ী, কেননা সে নিজেই তো ছেলেকে জিলিপি খাইয়ে আশ্বস্ত করে কাজে লাগিয়ে দেয়। পালানের মৃত্যুর জন্য বুড়ো বাবা না সংসারের অভাব দায়ী, এ প্রশ্ন যেমন তাড়িত করে তেমনি এ জিজ্ঞাসাও তো উঁকি দেয় যে, শুধুই কী পালানের বাবার প্রয়োজন ছিল পালানকে গৃহভৃত্য করার? জয়দীপ ও অদিতির মতো মধ্যবিত্তের সংসারে পালানদের কী কোনো প্রয়োজন ছিল না? ছিল বলেই অদিতির মতো মধ্যবিত্ত গৃহিণীর পক্ষেই বলা সম্ভব হয়ে উঠল—

"আমি সোনা চাই না, রূপা চাইনা, আমি বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার চাই না, লাক্সারি ফ্ল্যাট চাই না, আমি শাড়ি, গাড়ি, ফ্রীজ, রেডিওগ্রাম চাই না, কালো টাকা রাখার জন্য ব্যাঙ্কের লকার চাই না, আমি শুধু একটি বালক ভৃত্য চাই।"[৬]

পালানের মৃত্যুতে জয়দীপ একদিকে যেমন তার বাবাকে দায়ী করে, অন্যদিকে এস.আই

মুখার্জি ভেন্টিলেটর না থাকার প্রসঙ্গ তুললে অনায়াসে বাড়িওয়ালাকে দায়ী করে। আবার সেই বাড়িওয়ালা নটবর রায় যে কী না পালানের মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত কলের জল থেকে শুরু করে আচার ব্যবহারে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের মধ্যে ব্যবধান রেখে চলে সেই বাড়িওয়ালাই পালানের মৃত্যুতে কলের জলের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনে। এমনকী এতোদিনকার বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের মধ্যে যে অদৃশ্য, দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছিল তাও যেন মুহূর্তে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। বাড়িওয়ালা জয়দীপের সমপর্যায়ে নেমে আসে। বাড়িওয়ালা নটবর রায় নিজেকে বাঁচাতেই জয়দীপের সঙ্গ দিচ্ছে। কারণ ভেন্টিলেটার না থাকার দায়টা তার উপরই পড়ে। তাই একই বৃত্তের মধ্যে থেকেও এতোদিনকার এক সূক্ষ্ম ব্যবধানের প্রাচীর ভাঙতেও সময় লাগে না।

> "মধ্যবিত্ত একটি সংকীর্ণ বৃত্তে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে; ঐ বৃত্তের মধ্যেই চলছে তার উত্থান-পতন। এই বৃত্ত, এক হিসেবে, প্রত্যেক ইনডিভিজুয়াল-এর আত্মবৃত্তও বটে, যা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে গেলেও তার বাইরের ঠাঁট বজায় রাখতে মধ্যবিত্ত সদা তৎপর।"[৭]

এই একই বৃত্তের মধ্যে উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র সংযোজিত হয়ে যায়, একে অন্যের সঙ্গে।

জয়দীপের নিজেকে চিরে চিরে দেখার আত্মকথনে উঠে আসে অভিজিতের কথা। অভিজিৎ পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। সচ্ছল, বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। সেই অভিজিৎ নিজের জুতো বেয়ারাকে দিয়ে খুলে নেওয়ায় জয়দীপের মনে হয় অভিজিৎ মানুষের আত্মমর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। অথচ নিজের বাড়ির বাচ্চা চাকর যে কি না প্রচণ্ড শীতের রাতে খোলা বারান্দায় শতরঞ্জির মতো পাতলা তোষক ও ছেঁড়া চাঁদর সম্বল করে রাত কাটায়, সেক্ষেত্রে জয়দীপের মনুষ্যত্বের আত্মমর্যাদা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না। আসলে অন্যের ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার প্রবণতা মধ্যবিত্তের সহজাত।

ন্যায়-অন্যায়ের টানাপোড়েনে জয়দীপের মনে পড়ে শ্যামলীর কথা। জয়দীপের আত্মকথনে আমরা জানতে পারি শ্যামলী অদিতির বন্ধু, একসময়ের সহপাঠী। জয়দীপকে সে ভালোবাসত।

কিন্তু জয়দীপ সেই ভালোবাসাকে মর্যাদা দেয়নি। শ্যামলীর নিঃশব্দ ভালোবাসা জয়দীপের কাছ থেকে নিঃশব্দেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু পালানের আকস্মিক মৃত্যুতে ঘটনার পাকেচক্রে জয়দীপের সঙ্গে শ্যামলীর সাক্ষাৎ ঘটে। যে অভিমান বোধে একদিন শ্যামলী জয়দীপের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল সেই আবার তাকে কাছে পেয়ে অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে দ্বিধান্বিত হয় না। পাশাপাশি যে জয়দীপ একসময় শ্যামলীর তুলনায় অদিতিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করত, অদিতিকেই ভালোবাসার মধ্যে গর্ব অনুভব করত, শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হবার পর এতোদিনকার সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে তাকে কাছে টেনে নেয় তাও আবার সেই জায়গায় যেখানে একসময় অদিতিকে কাছে টেনে নিয়েছিল—

> ''আমার মধ্যে সেই মুহূর্তে কি ঘটে গেল জানি না। আমার মনে হলো শ্যামলীর চেয়ে অপরূপ আর কেউ নেই। কারণ এই শ্যামলীর কাছে দুহাত বাড়িয়ে আমি যা কিছু চাইবো, আমি পেতে পারি। ... তারপর কখন যে সেই ঘাসের আসন থেকে উঠে আমরা দুজনে কংক্রিটের বেদীর অন্ধকারে গিয়ে বসেছিলাম, কখন আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেশে আদর করেছিলাম, আমি নিজেই জানি না।''[৮]

এই কারণেই শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা জয়দীপ অদিতিকে বলতে পারে না, এক আত্মগ্লানি যেন কাজ করে। একসময় শ্যামলীকে নিয়ে মন খুলেই দুজনে হেসে উঠেছে, কারণ জয়দীপ তখন অদিতিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। অদিতির মনও একটি সুখী স্বপ্নের নেশায় মগ্ন হয়ে থাকে। কলেজে পড়ার সময়ে আলাপ, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দু'শো টাকা মাইনের চাকুরে জয়দীপের সঙ্গে এই একতলার বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসে। সময়ের স্বাভাবিক নিয়মেই জীবন এগিয়ে চলে। অদিতি মা হয়। কিছুদিন পর ছেলে টুকাইয়ের স্কুলে ভর্তি হওয়া ও সঙ্গে বাচ্চা চাকরের প্রয়োজন বোধ— এসবের মধ্যে কোথায় যেন তার স্বচ্ছ স্বাভাবিক ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়ে যায় নিজের অজান্তেই। নিতান্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত মেয়ের মতোই অদিতির মেজাজও খিটখিটে

হয়ে যায় একটি বালক ভৃত্য পালিয়ে গেলে। যেন মনে হয় সংসারে সুখ স্থায়ী হতে পারে একমাত্র বালক ভৃত্যটি স্থায়ী হলে। এসব ঘাত-প্রতিঘাতে সান্যাল দম্পতির সংসার জীবন এগিয়ে চলে। বিপত্তি ঘটে তখনই যখন পালানের মৃত্যু ঘটে। জয়দীপের মতো অদিতিও পালানের মৃত্যুর জন্য বাড়িওয়ালা নটবর রায় ও পালানের বাবাকে দোষারোপ করলেও পালানের বাবাকে ছেলের মুখাগ্নি করার মতো নির্মম কথাটি বলতে পারে না। একই বৃত্তে থেকে এখানেই জয়দীপ ও অদিতি কিছুটা স্বতন্ত্র। হয়তো নিজেও সে একটি সন্তানের মা বলে এইটুকুন তফাৎ লক্ষ করা যায়। আর তাই জয়দীপ যখন পালানের বাবাকে অনুরোধ করে শ্মশানে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার তখনই অদিতির মধ্যে ফুটে ওঠে এক অসহায়ত্ববোধ—

> ''তুমি না টুকাইয়ের বাবা, ছেলের বাপ হয়ে তুমি ওকে বলতে
> পারবে মৃতপুত্রের মুখাগ্নি করার কথা।''[৯]

হারান মণ্ডল অর্থাৎ পালানের বাবা এক সহজ সরল গ্রাম্যব্যক্তি। সংসারে পাঁচজনের খাবার জোটাতে পারে না। তাই ছেলেকে নিয়ে শহরে আসে কাজ জুটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায়। শুধুমাত্র মধ্যবিত্তরা নয় নিম্নবিত্ত জীবন ও যন্ত্রসভ্যতার ফলে গ্রামজীবন ক্রমশ শহরমুখী হয়ে উঠেছে এ যেন তারই প্রতিমূর্তি। শহরে এসে পালানের ঠাঁই হয় সান্যাল দম্পতির সংসারে। আর্থিক অনটন যেমন মানুষকে বিপন্ন করে তোলে তেমনি মানবিক মূল্যবোধকেও আঘাতপ্রাপ্ত করে। সেজন্যই মাতৃহীন পালানকে দূরে ঠেলে দিতে বাধ্য হয় অভাবগ্রস্থ পিতা। শুধু ভালোমতো থাকা খাওয়ার বিনিময়ে এবং অবশ্যই কুড়ি টাকা মাইনে। খাওয়া জুটলেও ভালোমতো থাকার ব্যবস্থা কী জুটেছিল পালানের? না জোটেনি। যে বাবা বাবুদের বাড়িতে ভালোমতো থাকতে পারবে ছেলে, এই আত্মতুষ্টি নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল, সেখানে থাকার জায়গার অভাবে পুত্রের মৃত্যু কি সহজে মেনে নেওয়া যায়? আর তাই ছেলের মৃত্যুতে একবুক অসীম শূন্যতা নিয়ে কাঠ হয়ে থাকে হারান মণ্ডল। সে কারণেই হয়তো জয়দীপ যখন বলে মৃত পুত্রকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য শ্মশানে যাবার কথা, সে কিছুতেই রাজি হয় না—

> ''শোকের মধ্যে বোধহয় প্রতিজ্ঞার মত কিংবা কোন দৃঢ়

শপথবাক্য উচ্চারণের মত লুকোনো কোন অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে। কেউ তাকে নড়াতে পারে না। একমাত্র পুত্রের মৃতমুখ দেখতে সে কিছুতেই রাজি হলো না। হয়তো সেই জীবন্ত মুখখানাকে চিরকালের জন্যে স্মৃতি করে রাখবে বলে।"[১০]

এইভাবে হয়তো হারান মণ্ডল তার অন্তরে সযত্নে লালিত করে রাখে মৃত পুত্রের জীবন্ত মুখচ্ছবি।

'খারিজ' উপন্যাসের আরেকটি অন্যতম চরিত্র হল রাধানাথ। রাধানাথ জয়দীপের অফিসে চাকরি করে। সহকর্মী হওয়ার পাশাপাশি জয়দীপের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুত্বের বাঁধন আরেকটু দৃঢ় হয় পালানের মৃত্যুতে। সে জয়দীপকে সঙ্গ দেয়। থানা পুলিশ থেকে শুরু করে পালানের মৃতদেহ ছাড়িয়ে আনা, শ্মশানে পৌঁছানো, শেষকৃত্যে জয়দীপকে সঙ্গদান এমন কি করোনারের কোর্টে হাজির হওয়ার সময়ও জয়দীপ ও অদিতির পাশে থেকে অভয় দান করে। যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় জয়দীপদের জয় নিশ্চিত। কারণ জয়দীপের দলেই তো সবরকম ইনফ্লুয়েন্স বর্তমান, ডাক্তার, উকিল, এস. আই। পালানরা তো সবসময়ই সহায় সম্বলহীন। তাই পালানদের মৃত্যুতে কেউ প্রতিবাদ করে না। সেজন্য অনায়াসেই বাড়িওয়ালা নটবর রায় পালানের বাবার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। করোনারের কোর্টে রায় বেরোয়—

"ইট্ ওয়াজ এ কেস অফ্ প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল্ অ্যাকসিডেন্ট।
... অ্যান্ড হেন্স দি কেস ইজ ক্লোজড।"[১১]

।।দুই।।

'খারিজ'-এর পরের বছর 'লজ্জা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে কথক অনিমেষ। অনিমেষের পাশাপাশি উপন্যাসে যাদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় তারা হলেন—বাণীপিসিমা, পিসেমশাই, রেণু, অরুনদা, টুনটুন, বাবুল প্রমুখ। 'লজ্জা' উপন্যাসটি আপাত দৃষ্টিতে মানসিক ভারসাম্য হারানো শ্বশুরবাড়ি ফেরত একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের

সূচনা হলেও এরমধ্য দিয়েই মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে চেয়েছেন কথাকার রমাপদ চৌধুরী। প্রসঙ্গকথায় লেখক নিজেই ব্যক্ত করছেন উপন্যাসটি রচনার উদ্দেশ্য। রমাপদ জানিয়েছেন যে লজ্জা আসলে কোনো অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় শ্বশরবাড়ি থেকে চলে আসা মেয়েকে নিয়ে একটি পরিবারের সমস্যার কাহিনি নয়। তিনি দেখাতে চেয়েছেন মধ্যবিত্ত জীবনের সবকিছুকেই গোপন করার প্রবণতা।

''খারিজ' উপন্যাসের মতো 'লজ্জা' উপন্যাসটি আত্মকথন রীতিতে ব্যক্ত হলেও দুটি উপন্যাসের কথকের অবস্থান ভিন্ন। 'খারিজ'-এর কথকের পরিণত বয়স এবং ঘটনার সঙ্গে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'লজ্জা'র কথক এক কলেজ পড়ুয়া, উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু যে পরিবার সেই পরিবারের সে আশ্রিত। ফলে আশ্রিত হওয়ার কারণে সে অনেকটা নির্লিপ্তভাবে ঘটনাগুলোকে দেখার চেষ্টা করে, যদিও শেষপর্যন্ত আত্ম-আবিষ্কারের নিরিখে নিজের দিকে আঙুল তোলে। মফস্বলের নিতান্ত সাধারণ পরিবারের ছেলে অনিমেষ। পড়াশোনার জন্য কলকাতায় এসেছে। দূর সম্পর্কের এক পিসিমা অর্থাৎ বাণীপিসিমার বাড়িতে তার থাকার জায়গা ঠিক হয়েছে। গ্রামের ছেলে অনিমেষ প্রথমে স্বচ্ছন্দবোধ করতে পারে না স্বাভাবিকভাবেই। সাজানো গোছানো পরিপাটি পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে কিছুদিন সময় লাগে। ধীরে ধীরে পারিবারিক কাজকর্মে সে হাত মেলায়, নিজেকে মিলিয়ে নেয় এই পরিবারের একজন হিসেবে। কিন্তু হঠাৎই সে আবিষ্কার করে সে একজন আউটসাইডার। রেণু যখন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসে তখন তাকে সাক্ষ্য হিসেবে পিসেমশাই অরুণদার সামনে তুলে ধরেন, আউটসাইডার হওয়ার সুবাদে। সে কোনভাবেই নিজেকে বাইরের লোক হিসেবে মেলাতে পারে না বলেই স্বাভাবিক অস্বাভাবিকের টানাপোড়েন চলতেই থাকে। একসময়ে যে রেণুই এই বাড়িতে তাকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল, একদা যে রেণুকে নিয়ে তার মনের গভীরে ভালোবাসার বীজ বপন করেছিল সেই রেণুই যখন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ফিরে আসে শ্বশুরবাড়ি থেকে তখন প্রথমটা রেণুকে অস্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে না কথক অনিমেষ। তাই তার মনে হয়—

''বাণীপিসিমার এত যে দেব দেবীতে ভক্তি, ঠাকুরঘর নিয়ে

থাকেন, কিন্তু তিনিও তো মায়ের মন্দিরে যান পিসেমশাইকে লুকিয়ে লুকিয়ে। এটাও তো অস্বাভাবিক। পিসেমশাইয়ের সবটাইতো অ্যাবনরমাল। শুধু মক্কেলদের কাছেই তিনি স্বাভাবিক, সংসারের কোন খবরই রাখেন না। মুখের ওপর বলে দিলেন আউটসাইডার, অথচ চাইছেন নিজের বাবা-মাকেও আমি যেন বাইরের লোক ভাবি, যেন এ বাড়ির সুখ-দুঃখের কথা লিখে জানিয়ে না দিই।"[১২]

অথচ ক্রমশ রেণুর ইনস্যানিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে কথকের কাছে। কিন্তু রেণুর ইনস্যানিটি দৃঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথক নিজেও যেন বিব্রত বোধ করেন।

উপন্যাসের অন্যতম একটি চরিত্র হচ্ছে বাণীপিসিমা। যিনি রেণু, টুনটুন, বাবুল, সুদীপের মা। যার দিন অতিবাহিত হয় নিত্য নৈমিত্তিক গৃহকর্ম ও পূজার্চনা নিয়ে। এই বাণীপিসিমা যিনি রেণুর গর্ভধারিণী মা যে কি না পাশের বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন সেই মা-ই রেণু ফিরে আসার পর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে টুনটনকে চুল আঁচড়াতে দেখে পর্দা ফেলে দিতে নির্দেশ দেন। যদি কেউ রেণুকে দেখে ফেলে। যেন রেণু অপরাধী ইনস্যানিটির জন্য। রেণুর অপ্রকৃতিস্থতা অন্যদের চোখে তাদেরকে ছোটো করে দেবে। তাই রেণুকে গোপন করে রাখার প্রয়াস চলে অহরহ। বাড়িতে আত্মীয় স্বজন এলেও তাদের বিদায় না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। ক্রমশ বাড়ির প্রত্যেকেই রেণুর প্রতি ভালো ব্যবহার ধরে রাখতে পারে না। এমনকি রেণুর মা বাণীপিসিমাও সেই দলভুক্ত। রেণুর ইনস্যানিটি স্পষ্ট হওয়ার ফলে ক্রমশ তাকে এড়িয়ে চলার মনোবৃত্তি তৈরি হয় বাড়ির প্রত্যেকের কাছেই, কটু ব্যবহার করতেও কেউ দ্বিধাবোধ করে না। বাণীপিসিমা বাড়িতে সত্য নারায়ণের পুজোর জোগাড় করেছেন দেখে অস্বাভাবিক রেণু স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে আসে —

"মা, তোমাকে না ঠিক ঠাকুর-ঠাকুর লাগছে। মা দুগ্‌গার মত।... তোমার কোলে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, এমন মা-মা

লাগছে।... এতসব পুজোর জোগাড়, তোমার কষ্ট হবে মা। আমি একটু করে দিই।... আমি বরং সিন্নিটা গুলে দিই।... সঙ্গে সঙ্গে যেন আঁৎকে উঠলেন বাণীপিসিমা।... বাণীপিসিমার গলার স্বর কেমন রুক্ষ হয়ে উঠলো। বললেন, তুই সিন্নিতে হাত দিলে কেউ খাবে না, যা বড় বড় নখ তোর হাতে। রেণুর মুখ মুহূর্তের মধ্যে কেমন রক্তহীন হয়ে গেল। ওকে বড় অপ্রতিভ দেখালো। বিবর্ণমুখে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ও চলে গেল।"[১৩]

রেণু যখন সবাইকে ভালোবাসতে চাইছে তখন প্রত্যেকেই তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এ উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র হচ্ছে পিসেমশাই, যিনি রেণুর বাবা। পেশায় উকিল, কোর্ট এবং মক্কেলদের নিয়ে যার সারাটা দিন কাটে। নিজের ধোপদুরস্ত চেহারাটি বজায় রাখতে সদা সচেতন। মক্কেলদের চোখের আড়ালে যেমন পায়ের এগজিমাকে গোপনে চুলকে নেন চেয়ার ঘুরিয়ে, তেমনি রেণুকেও আড়াল করতে চান। তাই কোর্ট থেকে ফিরে ক্লান্ত পিসেমশাই চেয়ারে বসলে রেণু পরম স্নেহে মাথাটিপে দিতে চাইলে তিনি তাকে বারণ করেন। কারণ রেণু নোংরা, তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। দুর্গন্ধ কী কেবল রেণুর শরীরে, না কী সেটা মধ্যবিত্ত মনের দুর্গন্ধ। যেখানে তাকে সারিয়ে তোলা জরুরি সে জায়গায় তাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মধ্যবিত্তের মিথ্যা সম্ভ্রমবোধ মানুষের জীবনের তুলনায় অনেক বেশি। তাই কথকের পিসেমশাইও এই সম্ভ্রমবোধের তাড়নায় নিজের মেয়েকে দূরে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত হন না। যখন দুঃখ পাওয়ার কথা তখন লজ্জাবোধের তাড়নায় কখন মধ্যবিত্ত মন তার অজান্তেই কাছের মানুষটিকে দূরে ঠেলে দেয়, ন্যূনতম মমতাবোধও অবশিষ্ট থাকে না।

বাড়ির বড়োদের পাশাপাশি ছোটোরাও রেণুকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে। টুনটুন ও বাবুল রেণুর ছোটো ভাই বোন। টুনটুন তার রেণুদিকে খুব ভালোবাসত। রেণুর ইনস্যানিটিতে এই ভালোবাসা যেন কখন হারিয়ে গেছে। টুনটুন শাড়ি পড়তে চাইছে বিয়ে বাড়িতে যাবে বলে তা দেখে রেণু তার বেনারসীখানা টুনটুনকে পড়তে বলে। বেনারসী পড়তে পারবে বলে টুনটুনের

খুব আনন্দ হয়। কিন্তু সেই আনন্দ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না। রেণু টুনটুনকে সাজিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করতেই টুনটুনের সমস্ত আনন্দ নিভে গিয়ে এক তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পায়—

> ''মাগো, তুই দিবি সাজিয়ে তার চেয়ে আমার বেনারসী চাই না।
> তুই যা নিজে সেজে থাকিস, দেখলেও ঘেন্না।''[১৪]

পাশাপাশি রেণু পরম স্নেহে ছোটো ভাই বাবুলকে খাইয়ে দিতে গেলে বাবুল রেগে গিয়ে থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে— ''খাবো না, খাবো না আমি। তোমার হাতে খেতে আমার ঘেন্না করে।''[১৫] এই প্রত্যাখান রেণুকে নতুন করে আঘাত দেয় কি না বোঝা না গেলেও এক অর্থহীন, অসহায়, ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে থাকে। কথক অনুভব করেন রেণুর কষ্ট, বেদনা। মধ্যবিত্তের ক্লাস কনশাসনেস খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে কথক বন্ধু পূর্ণ-র উক্তিতে—

> ''ব্রাদার... ঐ দুঃখটা আসলে ক্লাস কনশাসনেশ। মেয়েটিকে দেখে যেহেতু তুই বুঝতে পেরেছিস যে সে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ময়ে, দুঃখ সেজন্যেই। আমাদের ঐ বস্তির রামপিয়ারীকে দেখলে তোর একটুও দুঃখ হত না।''[১৬]

রেণুর জন্য অনিমেষ দুঃখ অনুভব করে। পরিবার পরিজনদের অবহেলা, অবজ্ঞা অনিমেষকে পীড়িত করে। যখন রেণুকে সকলের ভালোবাসা উচিত তখন তার ভালোবাসা সবাই ঠেলে দিচ্ছে এক তীব্র ঘেন্নায়—

> ''কথক অনিমেষ আহতবোধ করে। রেণুর এই পরিণতির জন্য নিজেই কী কম দায়ী? কেননা রেণুই তো তার ভালোবাসার গোপন ডালি সযত্নে লালিত করেছিল, যা অনিমেষ বুঝতে পারে নি। রেণু তো নানাভাবেই তাকে জানান দিতে চেয়েছিল তার ভালোবাসার কথা। জানতে চেয়েছিল অনিমেষ ওরফে মনুদার অন্তরের ভালোবাসাকে। সেজন্য বুকভরা অভিমান চেপে রেখে রেণু বলেছে 'তুমি বলো না মাকে, রেণু এখন বিয়ে করবে না।''[১৭]

যদিও অনিমেষ তার কথার অর্থ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের রাতে যখন রেণুর দুটো প্রাণহীন হাতে মালাটা পরাতে গিয়ে মালাটাই যখন ছিঁড়ে গেল তখন যেন অনিমেষের অন্তঃকরণে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। কথকের মনে পড়ে যায় রেণুর বইয়ে থাকা নামহীন, সম্বোধনহীন চিঠির সেই লাইনগুলো। রেণুর প্রতি ভালোবাসার তীব্র টান অনিমেষ অনুভব করে। পিসেমশাই, বাণীপিসিমা, টুনটুন, বাবুল, অরুণদা যেমন রেণুকে বুঝতে পারেনি, তেমনি কথক অনিমেষও রেণুকে জানতে পারেনি, বুঝতে পারেনি। রেণুর এই অপ্রকৃতিস্থতার কারণ হয়তো সে নিজেই। এই আত্ম-আবিষ্কার তার অন্তর্দহনকে অতিক্রম করতে পারেনি, সেজন্য এই চরম মুহূর্তেও নিজের ভালোবাসার কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেনি। অন্তর্দহনে জর্জরিত হয়েছে শুধুই।

আসলে মধ্যবিত্তের মিথ্যা সম্ভ্রমবোধ সমস্তরকম চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে। এখানে কথকের বার বার মনে হয়েছে যে সকলের মধ্যে রেণুকে এড়িয়ে চলার যে মানসিকতা তৈরি হয়েছে সেও একরকমের ইনস্যানিটি নয় কী? ইনস্যানিটির নামে নিজেদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে কুণ্ঠিত নয় রেণুর স্বামী থেকে শুরু করে পিসেমশাই পর্যন্ত। কথক অনিমেষও এই বৃত্তেরই অন্তর্গত। আসলে মধ্যবিত্তের এই স্বরূপের বাইরে তো কেউ নয়। সেজন্যই রেণুকে পাগলাগারদে পাঠানোর সময় পিসেমশাই ও অরুণদার পাশাপাশি কথকের সঙ্গদান প্রসঙ্গ এলে এক অসহায়ত্ববোধ অনিমেষের মধ্যে কাজ করে। রেণুর জিজ্ঞাসা এই অসহায়তাকে আরও বাড়িয়ে তোলে—

> ‘‘আমার কি হয়েছে? আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে কেন?
> আমার তো কিছুই হয়নি।... কেউ কিছু বলছে না কেন আমাকে?
> তুমি কিছু বলছ না কেন? মনুদা, তুমি অন্তত বলো, তুমি বলো।...
> অরুণদা, বাবা, ওরা সবাই আমাকে পাগল সাজাতে চাইছে কেন
> বল তো?... মনুদা, তুমি, তুমিও আমাকে পাগল সাজাতে চাইছো
> নাকি?’’[১৮]

এই অসহায়তাবোধ থেকেই শেষপর্যন্ত রেণুকে পাগলা গারদে রেখে আসার সময় রেণুর উক্তি হয়তো কথককেই অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে—

> ‘‘মনুদা, মনুদা, শেষে তুমিও আমাকে ঠকালে, তুমিই আমাকে পাগলা-গারদে ঠেলে দিয়ে গেলে। আমার মনে হলো আমার মাথায় কে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত হানলো। বাড়ি ফিরে আমার সন্দেহ হলো, আমি নিজেই কি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছি। তা না হলে পিসেমশাই, বাণীপিসিমা, অরুণদা, টুনটুন, সবারই মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেন মনে হচ্ছে সকলেই কত নিশ্চিত।’’[১৯]

।। তিন।।

রমাপদ চৌধুরীর ‘হৃদয়’ উপন্যাসটিও উত্তম পুরুষে বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসের কথক পরিবারের বড়ো ছেলে শুভেন্দু। কথকের সঙ্গে সহযোগী চরিত্র হিসেবে ওঠে আসে তার বাবা-মা, ভাই সুখেন্দু, নবেন্দু, বোন নমিতা, সুখেন্দুর স্ত্রী রীণা, নবেন্দুর স্ত্রী জয়া ও কন্যা তিলু নিজের প্রেমিকা ইনু। আখ্যানের বিস্তৃতি ঘটেছে বৃদ্ধ পিতার হার্ট অ্যাটাককে কেন্দ্র করে। হৃদযন্ত্রের সাময়িক বৈকল্যই পরিবারের সকলের হৃদয়হীনতাকে যেন টেনে বের করে আনে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কথক শুভেন্দু পরিবারের বড়ো ছেলে। পড়াশোনায় ভালো হলেও তার আর্থিক সচ্ছলতা নেই। সামান্য কিছু টিউশনি করে সে। যদিও শেষে একটি যৎসামান্য মাইনের চাকুরি জোটে যা কখনো অন্যের সামনে প্রকাশ করা যায় না। টাকাকড়ি দিয়ে সে সংসারে সাহায্য করতে পারে না। এরজন্য যে নিজেই হীনমন্যতার শিকার। এমনই এক সময়ে মেজভাই সুখেন্দুর বিবাহের সম্বন্ধ আসা নিয়ে পরিবারের সকলের আনন্দ দেখে অভিমানবশত নিজে বিয়ে করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ বিয়ের সুপ্তবাসনা এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত করে তোলে—

> ‘‘বাড়িতে কেউ আমার বিয়ের কথা তোলেনি। কেনই বা তুলবে, আমি যে তখনো রোজগেরে ছেলে হয়ে উঠতে পারিনি, চাকরি বাকরি ছিল না। বিয়ের গোপন ইচ্ছে ভিতরে ভিতরে কার না থাকে। আমারও ছিল। আমি নিঃশব্দে একজনকে

ভালবাসতাম। ভালবাসা পরমার্থ হতে পারে, কিন্তু তাকেও টাকার পায়ে দাঁড়াতে হয়।"[২০]

মা-বাবার প্রতি তার ভালোবাসা সম্পর্কে নিজেরই সন্দেহ জাগে। কারণ তার মনে হয়েছে সে বিয়ে করেনি বলেই মা-বাবার প্রতি তার এই ভালোবাসা। কিন্তু যদি সে ইনুকে বিয়ে করে তাহলে মা-বাবা কী আবার নতুন করে দুঃখ পাবে। আর্থিক অসচ্ছলতা তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেয় না ঠিকই কিন্তু বাবা-মা-র পাশাপাশি এতোদিনকার প্রেমিকা ইনুকেও ত্যাগ করতে পারে না—

"আমি তখন একটা দোটানার মধ্যে পড়ে গেছি। বাবার মুখের দিকে তাকালে নিজেকে বড় বেশি দুর্বল আর অসহায় লাগে। কারণ, আমি বেশ বুঝতে পারি এ বাড়িতে বাবার মুখের দিকে তাকানোর অবসর কারো নেই। আমি যদি এ বাড়ি ছেড়ে যাই তা হলে বাবা নির্ঘাৎ একেবারে ভেঙে পড়বে। আর সত্যি কথা বলতে কি, এখন ইনুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অভ্যাসের এবং কিছুটা কর্তব্যবোধের। যৌবনের সেই উত্তেজনা কিংবা রোমান্স এখন আর নেই। নেই বলেই আমি তো ওকে ছাড়তে পারি না। ওর যে এখন আর খড়কুটো ধরারও বয়স নেই।"[২১]

ছোটো ভাই নবেন্দু চাকুরিজীবী। তার একসময়ের বান্ধবীই হচ্ছে স্ত্রী জয়া। তাদের একমাত্র সন্তান তিলু। ছোটো ভাই নবেন্দু ঠাকুর দেবতা, পুজো আর্চা পছন্দ করে না। তাই ঠাকুর দেবতা সম্পর্কে নবেন্দু ঠাট্টা ইয়ার্কি করে, মাকে খোঁটা দেয়। মা ব্যথা পাবে জেনেও মাকে ভয় দেখায়। পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে চলাফেরা সবকিছুতেই সে বাড়ির অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র। তাই কথকের দৃষ্টিতে—

"পোশাক দেখলেই বোঝা যায় ওরা কত বদলে যাচ্ছে। প্যান্ট-কোট তো বাবাও পরেছে। আপিসের পোশাক হিসেবে।

বাড়ি ফিরেই বাবার অন্য চেহারা। ধুতি পাঞ্জাবি। কখনো খালি গায়ে। সুখেন্দুও খানিকটা সভ্যভব্য, আমাদের চোখে। নবেন্দুর কিন্তু চুলের এবং ট্রাউজার্সের ছাট অন্যরকম, হাঁটাচলায় অতখানি স্মার্ট না হলেও চলে, কথাবার্তায় একটু বিনয়ী হলে কি দোষ হতো! আমাদের পরিবারের কেউ মেয়েবন্ধু নিয়ে এসে বাড়িতে বসে আড্ডা দেবে, আমরা তো ভাবতেই পারি না।"[২২]

আসলে সময় যে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে তারই প্রতিচ্ছবি হল এই নবেন্দু চরিত্রটি। স্বভাবতই বসার ঘরে বান্ধবীকে নিয়ে মুক্ত মনে আড্ডা দেয়। কিন্তু নবেন্দুর বাবা এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেন না বলেই বড়ো ছেলেকে নির্দ্বিধায় বলে ওঠেন— "তুই বলে দিবি ওকে, আমার বাড়িতে ওসব চলবে না। না পোষায় এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে।"[২৩] সেই বাবাই আবার খুশি হয়ে ওঠেন বিজয়ার দিন মেয়েটি এসে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দেওয়ায়। স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্যের অন্তরালে স্নেহময় পিতার হৃদয় এতোদিনকার লালিত সংস্কার মেয়েটির প্রণামের কাছে হার মানে। অথচ নবেন্দু এই ক'বছর আগে পর্যন্ত প্রিয় ফুটবল টীম হেরে যাওয়ায় মরে যেতে চেয়েছিল। তার এই শিশুসুলভ সরল আচরণে সবাই হেসে উঠলেও শুভেন্দুর মনে হয়েছে—

"ও একটা ফুটবল টীমকে যখন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে, ওর হৃদপিণ্ডটা নিশ্চয় সোনা দিয়ে মোড়া।"[২৪]

কথকের ভুল ভেঙে যায়। কারণ নবেন্দু মেয়ের পড়াশোনার দোহাই দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরিকল্পনা। বাবার হার্ট অ্যাটাকের চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে তিলুর খবর নেওয়া। এই নবেন্দুই তো বাবাকে চূড়ান্ত আঘাত দেয় যখন সে বাবাকে না জানিয়ে জয়াকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। বাবাও একবুক কষ্ট চেপে রেখে বলে ওঠেন—

"কেউ সুখী হতে চায় আমি তাতে বাধা দেবো, তোরা ভাবলি কি করে। ... তোমরা কি মনে করো আমার এখানে হার্ট বলে কিছু নেই। তোরা আমাকে আগে বললি না কেন।"[২৫]

মেজভাই সুখেন্দু পড়াশোনা শেষ করে চাকরি পেয়ে যায়। চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারজন্য বিবাহ সম্বন্ধ আসতে থাকে। বিয়েও হয়ে যায় রীণার সঙ্গে। কিন্তু এই বিবাহ বিচ্ছেদের পর্যায়ে। সুখেন্দু এবং নবেন্দু দু'জনেই ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনা করেছিল। তাই তাদের উন্নতিতে কথকের মনে হয় নিজের বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করাটাই বোধহয় চাকরি না পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। সুখেন্দু নিজেও মনে করে ইংরেজি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। শুভেন্দুর ভালো মাইনের চাকরি না পাওয়াটা যেন তার জীবনের চরম ব্যর্থতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। আসলে অর্থ ছাড়া মানুষ অর্থহীন হয়ে পড়ে। অর্থের প্রয়োজন থাকলেও তার সঙ্গে আত্মীক যোগাযোগ একান্ত আবশ্যক। না হলে সুখী হওয়া যায় না। তাই কথকের মনে হয়—

> "একটা সংসারকে সুন্দর করে তুলতে হলে কিসের প্রয়োজন? টাকার? আমি তো একসময় তাই ভাবতাম। এখনো হয়তো ভাবি। কখনো কখনো মনে হয়, আমার ব্যর্থতাই বাবার জীবনে প্রথম আঘাত। কিন্তু সচ্ছলতা পেয়েও সুখেন্দু তো নিজের জীবনটাকেই সুখী করতে পারলো না। আমরা সকলের সঙ্গে সকলে এমনভাবেই জড়িয়ে আছি, কেউ একা সুখী হতে পারি না। এরই নাম সমাজ কি না কে জানে।"[২৬]

উপন্যাসটি নামহীন বৃদ্ধ পিতার হার্ট অ্যাটাককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ঔপন্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত মানসিকতার কিছু নগ্নরূপ তুলে ধরা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ক্রমশ পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে বিভেদের সীমারেখা তৈরি করে। তাই একই ছাদের নীচে থেকেও শুভেন্দু, সুখেন্দু, নবেন্দু যেন আলাদা হয়ে যায়। রোজগেরে হওয়া সত্ত্বেও মেজ ও ছোটভাই বাবার অসুখ নিয়ে তেমন উদ্বেগ প্রকাশ করে না। কথক শুভেন্দুই উপলব্ধি করতে পারে বাবার অবস্থানকে, সেজন্য তীব্র মানসিক যন্ত্রণাও সে অনুভব করে। মধ্যবিত্তের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে কিছু করতে না পারার যে সংকট তা শুভেন্দুর আত্মকথনে বারবার ফুটে উঠেছে। ডাক্তার যখন জানতে চায় এটা থার্ড অ্যাটাক কি না তখন শুভেন্দুর স্মৃতির জগতে

একের পর এক ঘটনা যা তার বাবার হৃদযন্ত্রটাকে অকেজো করেছিল তা-ই পর পর মনে আসতে থাকে। বাবা তো সংসারকে একটা বোটানিকসের গাছের মতো তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যার গুড়িটা না থাকলেও ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে গাছটি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাবার সেই সাধের স্বপ্নে কথকের আর্থিক অক্ষমতা তথা কিছু করতে না পারাও হয়তো বাবাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেছে। সুখেন্দুর বৈবাহিক জীবনের অশান্তিও তো কম আঘাত দেয়নি বাবাকে। না কি নবেন্দুর বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে করা বা তিলুকে লজেন্স দিতে বারণ করায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। এভাবে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত শুভেন্দু সিদ্ধান্ত নেয় বাবার পেসমেকারের টাকা জোগাড় করার। একদিকে অর্থের অভাব অন্যদিকে বাবাকে বাঁচানোর তাগিদ—এই দু'য়ে মিলে চরিত্রটিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। ব্যাঙ্কে টাকা নেই অথচ ভাইদের কাছে হাত পাততেও নারাজ, মা-বাবার জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থাকা সত্ত্বেও মাকে চেক সই করতে বলায় অপমানবোধ — এসমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে দীর্ঘদিনের প্রেমিকা ইনুর কাছেই শেষপর্যন্ত হাত পাততে হয়। যেন ইনু নিজের হৃদপিণ্ডটাকে দিয়ে শুভেন্দুর বাবার হৃদপিণ্ডটাকে চালু করেছে। তাই এতোদিনকার দ্বিধা কাটিয়ে ইনুকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাবা ও ইনুরও মধ্যে নিজেকে নিয়ে টানাপোড়েনের যবনিকা পাত ঘটায়—

> ''আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে ছুটতে ছুটতে আসবো। আমাদের দুজনের মনেই উদ্বেগ।... সেখানে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে একটি প্রাচীন স্বপ্ন, আশা, আদর্শ। একটি অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা, যে সকলকে সুখী দেখতে চায় বলেই অনন্ত দুঃখে দুঃখী।''[২৭]

শুভেন্দু অনুভব করে সমাজে সত্যিকার অর্থেই এক পালাবদল ঘটে গেছে। যেখানে প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই সুখী হতে চায় সুখেন্দু ও নবেন্দুর মতো। যৌথ পরিবারের মূল্যবোধে ফাটল ধরেছে। সবাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে যেখানে রক্তের সম্পর্কও তার নিজস্বতা হারাচ্ছে। হৃদপিণ্ড আছে কিন্তু হৃদয় নেই। স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা সবকিছুই যেন প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্র। আত্মকেন্দ্রিক হতে হতে কখন যে একাকীত্ব গ্রাস করে নেয় নিজের অজান্তেই। শুভেন্দুও এই

একাকীত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ—

> "... এই পৃথিবীতে, এই সমাজে, আমরা সবাই অসীম শূন্যতার মধ্যে একেবারে একা হয়ে যাবো।"[২৮]

।।চার।।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রমাপদ চৌধুরীর 'বীজ' উপন্যাসটি। 'বীজ' উপন্যাস সম্পর্কে টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—

> "Beej has a symbol, an unworldly professor of history. He is more concerned about reconstructing the lives of those who lived thousands of years age rather than making a success of his own. One day he asks for a rupee and walks out of the house, never to return. The rest of the book deals with the reactions of his family and their changing relationships. "[২৯]

গ্রন্থের প্রসঙ্গকথায় লেখক নিজেই বলেছেন—

> "এটি একজন হারানো মানুষের গল্প নয়, হারানো মূল্যবোধের গল্প। দামী মানুষদের মূল্যহ্রাসের গল্প। যতদিন তাঁরা আমাদের মধ্যে থাকেন, আমরা মূল্য বুঝি না, চলে যাওয়ার পর অনুভব করি বুক ফাটা হাহাকার।"[৩০]

লেখকের এই বক্তব্যের পরেও আমরা বলতে পারি যে 'বীজ' প্রতীক বা হাহাকারের কাহিনি নয়, এ এক আত্ম-আবিষ্কারের গল্প। শশাঙ্কশেখর যতদিন ছিলেন ততদিন পরিবারের কেউ তার মূল্য বুঝতে পারেনি, হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ার পর সংসারের সবাই নিজ নিজ স্মৃতিপটে শশাঙ্কশেখরকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। এই আবিষ্কার আত্ম-আবিষ্কারও বটে। যে জীবন সংসারের অন্যদের

কাছে অর্থহীন বলে মনে হতো আজ সেই জীবনের অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে তাদের নিজেদের জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। এতোদিন পর অর্থপূর্ণ এবং অর্থহীনতার মূল্য অনুধাবন করতে পারে। তাই কথাকার শশাঙ্কশেখরের পরিণতির চেয়েও ফিরে আসার বিশ্বাসটুকুই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন।

শশাঙ্কশেখর পেশায় অধ্যাপক হলেও তিনি ছিলেন পুরাতত্ত্বের একনিষ্ঠ গবেষক। স্ত্রী সুধাময়ী, দুই মেয়ে ঝুমা রুমা ও এক ছেলে অমুকে নিয়ে তার সংসার। শশাঙ্কশেখরের জগত —

> ''তিনদিকের দেয়ালে বইপত্র, অবশিষ্ট উলঙ্গ দেয়ালটিতে ঠেস দিয়ে আছে একটি পড়ার টেবিল। তার সামনে হাতলহীন চেয়ারটিতে বসেই তাঁর সর্বক্ষণ কেটে যায়। ছুটির দিনগুলো কিংবা অবসরের সময়টুকু।''[৩১]

হয়তো সেই কারণে বইয়ের খাতার বাইরে তাঁর তাকাবার সময় নেই। সেজন্যেই একটানা তিনদিন বৃষ্টির পর এক ভোরবেলায় তাঁর মনে হল এর আগে তিনি কখনো বৃষ্টি দেখেননি। পড়াশোনার জগতের বাইরে বৃষ্টির মতো এতো সুন্দর জিনিস আছে বলে তার কখনো মনে হয়নি। তাই আটচল্লিশ বছর বয়সেই তার এই আবিষ্কার যেন

> ''সমস্ত শরীরে এমন একটা শিহরণ খেলে গেল। যেন সত্যি সত্যি শেষ অবধি কি একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এই মুহূর্তে। অথচ তিনদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি চলছে।''[৩২]

এই ভালো লাগা থেকেই শশাঙ্কশেখর সবকিছুকে নতুন করে দেখতে শুরু করেন। প্রাচীন শিলালিপি থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক পোস্টে দুটি শালিকের বসে থাকা, পাখির ওড়ে যাওয়া—এসমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। শশাঙ্কশেখরের ইচ্ছে হয় সকলকে ডেকে ডেকে কথা বলতে। মনে হয় সুধাময়ী, ঝুমা, রুমা, অমু যদি তার মতো বৃষ্টি দেখত তাহলে তার খুব ভালো লাগত। কিন্তু তিনি জানেন, তাঁর কাছে যে বৃষ্টি আনন্দদায়ক বা অন্যরকম একটু শিহরণ জাগানো ভালো লাগা অন্যদের কাছে তাই হয়তো কাপড় শুকানো, কলেজ যাওয়া বা অফিস যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিরই নামান্তর। এতোকাল যেমন বৃষ্টি দেখেননি, তেমনি তাকিয়ে দেখেননি

সুধাময়ীকে, অমু, ঝুমা কিংবা রুমাকে। আর তাই তার মনে হয়— ''আমি সুধার দিকেও তাকিয়ে দেখিনি। আজ আর কেউ আমার দিকে তাকিয়ে দেখে না।''[৩৩] তাই ডেক্‌চেয়ারে বসে এইসমস্ত ভাবনাগুলো তাকে ভাবিয়ে তোলে। ভোরবেলাকার বৃষ্টির ছাট যেন তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকে অথচ কোনো কাজে মন বসে না। এই অবসরটুকু তার কাছে অফুরান হয়ে ওঠে। শশাঙ্কশেখর সাধারণত দুপুরে ঘুমোন না কিন্তু সেদিন ঘুমিয়েছেন বিকেল পাঁচটা অবধি। তাঁর মনে হয় আজ যেন তাঁর কাছে চিঠি আসবে, কিন্তু আসে না। তাই বৃষ্টি থামার পর শশাঙ্কশেখর বুকের মধ্যে কেমন একটা উদ্বেগ অনুভব করেন— ''কি যেন ঘটবে, কি যেন ঘটতে চলেছে। কোন নিদারুণ দুর্ঘটনা, কিংবা কোন অভাবনীয় আবিষ্কারের আনন্দ।''[৩৪] অবশেষে স্ত্রী সুধাময়ীর কাছে একটি টাকা চেয়ে নিয়ে কাছেপিঠে কোথাও ঘুরে আসার কথা বলে সেই যে বেরিয়ে গেলেন শশাঙ্কশেখর আর ফিরলেন না।

অন্যদিকে উপন্যাসের অন্যতম আরেকটি চরিত্র হচ্ছে শশাঙ্কশেখরের স্ত্রী সুধাময়ী। শশাঙ্কশেখরের নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনায় লজ্জায় নিজের ছেলেমেয়েদের দিকেও তাকাতে পারছেন না। বার বার সুধাময়ীর মনে পড়ে শশাঙ্কশেখরের বইয়ের ফাঁকে পেজমার্কের মতো একটি কাগজে তাঁর প্রিয় ছাত্রী অপর্ণার নাম বার বার করে লেখা। এই এক টুকরো কাগজ তাকে চরম লজ্জা, অপমানবোধের মুখে ঠেলে দেয়। শশাঙ্কশেখরের অন্তর্ধানে নিজেকে চরম অবমাননার হাত থেকে বাঁচাতে সুধাময়ীর একান্ত কাতর অভিব্যক্তি—

> ''একটা কাগজের টুকরোয় অপর্ণার নাম তুমি বারবার লিখেছিলে কেন? তুমি কি অপর্ণার রূপ আর যৌবনের দিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলে! সেই ভয়েই, নিজেকে বিশ্বাস করতে পারো নি বলেই কি তুমি পালিয়ে গেলে। তা হলেও, অন্তত সেজন্যও তুমি একবার ফিরে এসো। তোমার তো কারো ওপর মায়া নেই, ভালবাসা নেই, আমি জেনে গেছি আমার কথাও তোমার মনে পড়ে না, আমি জানি। অমু, ঝুমা, রুমা ওদের

ওপর তোমার কোন টান নেই। সেজন্যেই তো তুমি এভাবে চলে যেতে পেরেছো। এমন কি তোমার ঐ জীবনের সাধনা, ইতিহাসের সব ধারণা পাল্টে দেবে! তোমার ঐ পড়ার ঘর, বই মূর্তিটুর্তি, শিলালিপি, তোমার সেই অনেক কষ্টে রাজস্থানের কোন গ্রাম্যচাষীর দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে আসা বাইলিংগুয়াল সীল—কোনকিছুই তোমাকে তো আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি। তুমি অন্তত অপর্ণার জন্যেও একবার ফিরে এসো। আমি দুঃখ পাবো, তবু প্রাণপণ চেষ্টা করে আমি সবকিছু উপেক্ষা করবো। আমি আর কিছু চাই না, তুমি আমার আত্মসম্মান বাঁচাও। সমস্ত পৃথিবীর কাছে, নিজের ছেলেমেয়েদের কাছে আমি এভাবে মাথা নীচু করে থাকতে পারছি না।"[৩৫]

কিন্তু স্বামী সম্পর্কে তার এই ধারণা যে কতটা অবাস্তব তা তিনি নিজেও জানতেন। অন্যান্য সাধারণ মেয়ের মতো সুধাময়ীরও গর্ব ছিল স্বামীকে নিয়ে। সেই গর্ব উধাও হয়ে যায় বিয়ের পর যখন একটি সরুগলির মধ্যে পুরনো বাড়িতে নতুন সংসারের খাতা খুলতে হয়েছে। মধ্যবিত্তের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব তার মধ্যেও কাজ করে। সেই স্বভাবসুলভ মানসিকতার জন্য শশাঙ্কশেখরের প্রতি অভিমান পুঞ্জীভূত হয়। তার মনে হয়—

"নিজের কাছে একটু ছোট হতে পারলেই তো অনেকের কাছে বড় হওয়া যায়। কেউ তখন আর খোঁজও রাখে না সিঁড়ির ধাপগুলো কি দিয়ে তৈরি।"[৩৬]

শশাঙ্কশেখর সে প্রকৃতির লোক নন যে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যাবেন। তা সত্ত্বেও সুধাময়ী স্বপ্ন দেখেছেন। একটু ভালোভাবে থাকার, অন্যের চোখে নিজেকে দামি প্রতিপন্ন করার। তাই চাকুরিতে শশাঙ্কশেখরের পদোন্নতি হলে, মেয়ে ঝুমা চাকরিতে যোগ দিলে সুধাময়ী আবার নতুন উদ্যমে সংসার সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফ্রীজ, টিভি, সোফাসেট থেকে শুরু করে শশাঙ্কশেখরের

বইয়ের পুরোনো লোহার র‍্যাক বদলে দিয়ে নিয়ে আসেন আধুনিক ডিজাইনের বুক শেলফ। বাইরের আসবাব দিয়ে দামি করে তুলতে গিয়ে কখন যেন সেই মানুষটি থেকে দূরে সরে গেছেন, টেরই পাননি। একদা যে বাড়িকে সাজিয়ে গুছিয়ে অন্যের কাছে দামি করে তুলতে চেয়েছিলেন আজ তা-ই —

> ‘‘একটা মানুষের অভাবে আর সবই অর্থহীন হয়ে যায়, মূল্যহীন হয়ে যায়। এই বাড়িটা এখন যেন উৎকট সাজপোশাকে সাজানো একজন বিধবার মত।’’[৩৭]

সুধাময়ী অনুধান করতে পারেন মূল্যবান এবং মূল্যহীনের ফারাক। সুধাময়ী সেই মূল্যকে বুঝতে পারেন যা বাইরের প্রতিপত্তি দিয়ে অর্জন করা যায় না। শশাঙ্কশেখরের বলে যাওয়া সেই কথাগুলির মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন যা তার মনে বার বার জেগে ওঠে—

> ‘‘শিকড় থাকলে তবেই তো গাছ পাতা ফুল ফল। অথচ শিকড়টার কেউ খোঁজ রাখে না। একটু একটু করে একদিন হয়তো সভ্যতার শিকড়টাই শুকিয়ে যাবে, আর তখন যা -কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছো, তা একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে। এখন আমরা যেমন ইতিহাসের পাতায়, পাথরের গায়ে, মাটির তলায় সেই সভ্যতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু শিকড়টা খুঁজে পাচ্ছি না। পাচ্ছি শুধু বাড়িঘর, মূর্তি কিংবা মমি, কঙ্কাল, দুর্বোধ্য লিপি।’’[৩৮]

সেদিনের শশাঙ্কশেখরকে বুঝতে না পারলেও আজ অনুভব করেন তার অনুপস্থিতির মূল্য। তাই একদিন যেমন মনে হয়েছিল যে একটি টাকা নিয়ে কতদূর যাওয়া যায়, আজ মনে হচ্ছে যাওয়া নয় হারিয়ে যাওয়া যায়। ফলে এতোদিনকার দ্বিধা, লজ্জা, সংকোচ কাটিয়ে অপর্ণার হাতে তুলে দেন শশাঙ্কশেখরের বই থেকে আবিষ্কার করা সেই এক টুকরো কাগজ।

ঝুমা শশাঙ্কশেখর ও সুধাময়ীর বড়ো মেয়ে। সে অবিবাহিত, চাকুরি করে। সুধাময়ী যেমন

শশাঙ্কশেখরকে বুঝতে পারেন নি, তেমনি তার মেয়ে ঝুমাও বুঝতে পারেনি বাবাকে। সেজন্য শশাঙ্কশেখরের অন্তর্ধানের পরের দিন অফিসে ঢুকতে তার লজ্জা হয়—

> ''দুর্ঘটনা নয়, মৃত্যু নয়, শশাঙ্কশেখর ওদের ছেড়ে চলে গেছেন
> এ কথা কি বলা যায়। শোকের চেয়ে তার জ্বালা আরো বেশি।''[৩৯]

ঝুমার মনে হয় বাবা যে রহস্যজনক ও দুর্বোধ্য লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত ছিলেন সেই বাবাই আজ তাদের কাছে দুর্বোধ্য লিপি হয়ে গেছেন। ঝুমা সেই দুর্বোধ্য লিপির মধ্যেই খোঁজার চেষ্টা করে বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ। বুঝতে চেষ্টা করে সবাই যখন নতুনের খেলায় মেতে উঠেছে তখন শশাঙ্কশেখর কেন পুরাতনের মধ্যে ডুবে থেকেছেন। ঝুমা অনুভব করতে পারে শশাঙ্কশেখরের অনুসন্ধানপ্রবণ মনকে। উপলব্ধি করতে পারে শিকড়ের সন্ধানটাই আসল, যা না থাকলে বাকি সব অর্থহীন হয়ে পড়ে। একসময় নিজের বিয়ে হচ্ছে না বলে বাবার উদাসীনতা দায়ী করে ঠিকই, কিন্তু সেই কাঙ্খিত দিনটি এলে ঝুমা নিজে উদাসীন হয়ে পড়ে। বাইরের কোলাহল, সাজগোজের মধ্যেও ঝুমার মনে কোনো সাজ নেই। বার বার মনে হয় বাবা ফিরে আসবে। ঝুমাও বুঝতে শেখে মূল্যবোধের যথার্থ স্বরূপকে। বাবাকে হারিয়ে বাবার একনিষ্ঠতা, গবেষণা, সর্বোপরি বাবার মনের গভীরতাকে অনুধাবন করতে পারে। তাই বাবার অনুপস্থিতিতে মেকী মূল্যবোধ মূল্যহীন হয়ে যায় ঝুমার কাছে—

> ''আমাদের বর্তমান সভ্যতা একটা চলন্ত ঘড়ির মত, টিকটিক
> করে চলছে, তার বড় কাঁটাটা দ্রুত এক একটা ঘর পার হচ্ছে
> ঠিকই, কিন্তু সেই ঘড়িটার ছোট কাঁটাটাই নেই। ফলে ঘড়িটাই
> অর্থহীন হয়ে গেছে।''[৪০]

সুধাময়ী ও শশাঙ্কশেখরের একমাত্র ছেলে অমু। সে ব্যবসা করে। একজন অধ্যাপক তথা পণ্ডিত ব্যক্তির সন্তান হয়েও অমু পড়াশোনায় ভালো ছিল না। সেজন্য বন্ধুর সঙ্গে মিলে একটা ছোট ব্যবসা করে। উপন্যাসের চরিত্র থেকে অমু কিছুটা স্বতন্ত্র। প্রথম থেকেই সে বাবাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করে। বাবার পাণ্ডিত্য তথা জীবনদর্শন যে সে খুব একটা বোঝে তা নয়, কিন্তু সে বাবাকে

ভালোবাসে। এই ভালোবাসার প্রতিফলন বাবার সামনে ঘটে না, কেননা সামনাসামনি সে বাবাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। অমু জানে বাবার মধ্যে স্নেহ, মায়া, মমতা আছে। সেই বাবাই যখন তাদের ছেড়ে চলে যান স্বভাবতই অমু হিসেব মেলাতে পারে না। মা কিংবা বোনের মতো অমুও শশাঙ্কশেখরকে বুঝতে চেষ্টা করে। বাবার প্রতি অমুর নিজের একটা ক্ষোভ হয়তো ছিল। পুরাতত্ত্বের গবেষণা করতে গিয়ে বাবাও তো তাদের দিকে ফিরে তাকাননি। এ অভিজ্ঞান দীর্ঘক্ষণ থাকে না কারণ বাবাকে হারিয়ে বাবার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। শশাঙ্কশেখরের ফিরে আসা নিয়ে সংশয় থাকলেও সেই শংকাকে উপেক্ষা করে ফিরে আসার আশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। আসলে অমু জানে বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার দুঃখকে চেপে রেখে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। বাবার অবর্তমানে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তার কাঁধে তুলে নেয়। ধীরে ধীরে ব্যবসাকে বড়ো করার বড়ো বড়ো কন্ট্রাক্ট জোগাড় করতে হয়। সে জানে একদিন হয়তো সে সফলতার চরম শিখরে পৌঁছবে, কিন্তু ততদিনে মূল্যবান আর মূল্যহীনের ব্যবধান তার জানা হয়ে গেছে—

> ‘‘আমি তো একদিন এই সংসারের চেহারা বদলে দেবো। ছোট মেসোর মত,কিংবা অমিতেশবাবুর মতই আমি মাথা তুলে দাঁড়াবো। সবাই বলবে, অপদার্থ ছেলেটা সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে দিলো। দিব্যি টাকা রোজগার করছে। হয়তো বলবে, বাপটা সংসারের দিকে কখনো তাকিয়েও দেখেনি। আর আমরা জানবো, মা আমি ঝুমা রুমা, মনে মনে জানবো, সবকিছু থেকেও আমাদের কি যেন নেই। গর্ব। তখন আমাদের হয়তো অহঙ্কার থাকবে, গর্ব করার মত কিছু থাকবে না।’’[৪১]

আর তাই অমু এসমস্ত কিছু করেও বাবার প্রতি তীব্র টান অনুভব করে। গর্ববোধ করে অতনুর জন্য। অতনু শশাঙ্কশেখরের ছাত্র, যে কিনা শশাঙ্কশেখরের দেখানো পথে এগিয়ে চলেছে।

।।পাঁচ।।

'খারিজ', 'লজ্জা'-র মতো 'বাহিরি'-তেও কথাকার রমাপদ চৌধুরী নাগরিক মধ্যবিত্তের মুখোশটাকে খুলে দিয়েছেন। বিষয়গত দিক থেকে যদিও উপন্যাস তিনটির মধ্যে ব্যবধান রয়ে গেছে। 'খারিজ'-এ এক বালক ভৃত্যের মৃত্যু, 'লজ্জা'-য় রেণুর অপ্রকৃতিস্থতা, আর 'বাহিরি'-তে একটি ছেলের নুলো ভিখিরির হাতুয়া থেকে মি. বি.ডি. অধিকারী পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ধাপে ধাপে মধ্যবিত্তের মুখোশ উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বংশী আসলে সাক্ষী গোপাল মন্দিরের সামনে থাকা নুলো ভিখিরির হাতুয়া। অভাবের তাড়নায় ছোটোবেলাতেই তার মা তাকে বেঁচে দেয় এক পঙ্গু ভিখিরির কাছে। সেই থেকে তার পরিচয় হয়ে ওঠে নুলো ভিখিরির হাতুয়া। সাক্ষীগোপাল মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে দয়াময়ী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। দয়াময়ী ও সুধাময়ের দয়ায় আশ্রয় হয় তাদের পরিবারে। সেখানে তাকে চলে ঘসামাজার আয়োজন। গায়ের ময়লা, পোশাক পরিচ্ছদ এমনকি মুখের ভাষাও বদলে দেবার আয়োজন চলে। সুধাময়ের কন্যা শুভা শাসিয়ে দেয় তাকে সুধাময়দের সমাজের উপযোগী কথা বলতে হবে। শিখিয়ে দেয় কথা বলার ধরণ। বংশীর স্বগতোক্তি 'হায় ইখানেও আমি বাহিরি হলাম।"[৪২]

একথা বলার কারণ এই যে সাক্ষীগোপাল মন্দিরের সামনে অন্যান্য ভিখারীরা তাকে ভিক্ষা করতে দিত না, কারণ সে বাঙালি। ভাষিক পরিচিতি তাকে বাহিরিতে পরিণত করে। সেই একই সমস্যা প্রথমে সুধাময় বাবুদের পরিবারে দেখা দেয়। সেখানে বাঙালি হওয়ার অপরাধ নয়, নীচুতলার বা বলা ভাল নিম্নবিত্ত জনজীবনের ভাষা ব্যবহার করায় শুভার আপত্তি। ধীরে বংশীর ভাষার পরিবর্তন ঘটে। সে লেখাপড়া শেখে, স্কুলে ভর্তি হয়, ভাল রেজাল্ট করে। নীচুতলার ঘর থেকে দোতলায় ঠাঁই হয়। যদিও বড়ো মেয়ে বিধবা হয়ে আসার পর দোতলার ঘর থেকে তার স্থান হয় সিঁড়ির তলায়। এসমস্ত কিছুই বংশীর হয়ে ওঠাকে আটকাতে পারে না। একে একে স্কুল, কলেজ পাশ করে চাকরিতে যোগ দেয়। ক্রমাগত চাকরিতেও পদোন্নতি হয়। বংশীর ধাপে ধাপে

উন্নতি ক্রমশ সুধাময়ের ছেলে সঞ্জয়, যাকে বংশী 'ছোটদা' বলে ডাকত সেই ছোটদার অফিসে সিনিয়র হিসেবে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও বংশী সেখানে কাজে যোগ দেয় না। এখানেই বংশী চরিত্রটি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। যেন মনে হয় তার হয়ে ওঠা ও জীবনে উপকারীর মূল্য রাখতে গিয়ে বংশী শেষপর্যন্ত কাজে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

মধ্যবিত্তের বিশ্বাস ও আচরণে কোন মিল না থাকার প্রসঙ্গটি কথাকার তাঁর আখ্যানভাগে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে লেখক নিজেই বলেছেন—

> ''...মধ্যবিত্ত মানুষ তার নিজের অজান্তেই কখনো অসহায় কখনো ক্ষমতাবান—নিজের নিজের খুঁটিতে।... তাদের মধ্যে মহত্ত্ব যে নেই তা নয়—আদর্শও আছে।... অথচ এরাই এক এক সময় অন্য চেহারা নিয়ে দেখা দিচ্ছে।''[৪৩]

মধ্যবিত্তের আদর্শ তথা মহানুভবতা তার মধ্যেও বর্তমান। তাই তিনি ভিখিরিকে চাকর বানিয়ে তোলেননি। নিজের কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে বংশীকে পড়াতেন। একদিকে যেমন বংশীকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা চলছে অন্যদিকে মধ্যবিত্তের প্রতিভূ যিনি পরোপকারী বলে পরিচিত সেই ব্রজবাবুই কি না বলে উঠেন—

> ''সকলেই শিক্ষিত হয়ে উঠলে এত চাকরি কোথায় পাবে? ভদ্রলোকের ছেলেরাই তো চাকরি পাচ্ছে না। ওকে বরং করে খেতে দাও কিছু একটা কাজ শিখুক...''[৪৪]

এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বংশীকে সুধাময়বাবু শিক্ষিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় নাম নিয়ে একটি সমস্যা তৈরি হলেও সমস্যা মিটে যায় তাড়াতাড়ি। নামহীন সেই ভিখারী ছেলেটি যেহেতু সুধাময়বাবুরা সাক্ষীগোপাল মন্দিরের সামনে থেকে তুলে এনেছেন তাই তার নামকরণ করা হয় বংশীধর। কিন্তু পদবীরওতো প্রয়োজন হয়, যেহেতু নুলো ভিখিরি ওর অধিকারী ছিল তাই তার পদবীতেও যোগ করা হয় অধিকারী শব্দটি। স্কুলের ইউনিফর্ম, স্কুলের খাতায় নতুন নামকরণ করা নিয়ে সুধাময়বাবুদের গর্ব অনুভব হয়। সেই বংশীই যখন একের পর

এক সফলতা অর্জন করে চলে তা যেন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। সুধাময়ের পরিবারই তো বংশীকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল, মানুষ করে তুলতে চেয়েছিল কিন্তু সেই বংশীই যখন সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠল তখন তার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করে। আসলে আমরা মহানুভবতা দেখাতে পারি, বংশীদের উপরে তোলার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু সমকক্ষ বলে মানতে নারাজ। তাই রবিবারের অলস মধ্যাহ্নে বংশীর আগমন ঘটলেও সুধাময় ঘুমের ভান করে পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন। কেননা—

> ''একজন অসহায় মানুষের উপকার করা যায়। অক্ষমকে হাত ধরে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্যের হাত বাড়ানো যায়। কিন্তু সেই মানুষই যখন সবল আর সক্ষম হয়ে ওঠে, সমান হয়ে দাঁড়াতে চায়, কিংবা তাকেও ছাড়িয়ে যায়, তখন সে অসহ্য, অসহ্য।''[৪৫]

দয়াময়ী ও সুধাময়ের ছেলে সঞ্জয়েরও ভূমিকা আছে বংশীর উত্তরণের ক্ষেত্রে। বংশীকে স্কুলে ভর্তি করানো, তার পড়াশোনা দেখা এসব সঞ্জয়ও নির্দ্বিধায় করে যায়। এসব করার মধ্যে সঞ্জয় গর্ব বোধ করে যে এক ভিখিরিকে ওরা চাকর বানিয়ে দেয়নি। বংশীর উত্তরণ চাইলেও বংশী যখন তাকে ছাড়িয়ে যেতে চাইল তখন সঞ্জয়ও তা মেনে নিতে পারে না। মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা তাই সঞ্জয়ের বয়ানে খুব সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে—

> ''ওদের আমরা ভাল চাই। খেয়েপরে থাকুক, শিক্ষিত হয়ে মানুষ হয়ে উঠুক। যদি পারে সমান হয়েই থাকুক না। তা বলে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে! আমাদের ওপরে উঠে যাবে?''[৪৬]

মধ্যবিত্তরা নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট। সঞ্জয় চরিত্রটি খুবই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। একদিকে যেমন বংশীর চলাফেরায় ঈর্ষাবোধ অন্যদিকে নিজের সিনিয়র হিসেবে বংশীর কাজে যোগ দেওয়ায় সঞ্জয়কে নিরাপত্তাহীনতার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। দিশেহারা সঞ্জয়ের সিনিয়র হিসেবে কাজে যোগ দেয় না। আর এখানেই প্রথম সঞ্জয় বংশীর

মহানুভবতাকে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতির মধ্যে দিয়েই যেন কিছুটা হলেও বংশীর প্রতি যে তার বিরূপ মনোভাব সেই অপরাধবোধের জন্ম দেয়, হয়তো বা এরই নাম প্রায়শ্চিত্ত—

> ‘‘আমি জানি জানি। আমি তোর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি বারবার বলেছি, তোর কোনও কৃতজ্ঞতা নেই। আজ আমি তোর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। তুই আমাকে অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচিয়েছিস, অপমান থেকে বাঁচিয়েছিস।’’[৪৭]

অন্যদিকে শুভা যে সুধাময় ও সঞ্জয়ের মতোই বংশীকে নিজেদের সমাজভুক্ত করতে চেয়েছিল। সেজন্য চেষ্টাও করে গেছে ক্রমাগত। বংশীর পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা আমূল বদলে ফেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই বংশীই যখন তার পোশাক পরিচ্ছদ এমনকি কথাবার্তাও বদলে ফেলল তখন সে আর বংশীকে সহ্য করতে পারে না। শুভার কেবলই মনে হয় বংশীর মধ্যে অহঙ্কারবোধ কাজ করছে। তাই বাসে, ট্রামে হাজার অচেনা বংশীর পাশে যেতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, যত সংকোচ বংশীর বেলাতেই। কেননা বংশীর অতীতটা তার জানা। সঞ্জয়ের সিনিয়র হিসেবে কাজে যোগ দিতে না আসায় শুভা খুব সুন্দরভাবে তার কারণ বলে যে বংশীর অতীতটা সঞ্জয়ের জানা বলেই ভয়ে বংশী কাজে যোগ দিতে পারে না।

সুধাময়, সঞ্জয় কিংবা শুভা কেউই বংশীকে সহ্য করতে পারে না। বংশী যতই তার অতীতকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ততই তাকে সেই অতীতের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। এখানে দয়াময়ী যেন এদের থেকে একটু আলাদা। প্রথমত তীর্থযাত্রায় বংশীকে নিয়ে আসার কথা দয়াময়ীই বলেন। এরপর থেকে তার উপর স্নেহ, মায়া, মমতা সবই উজার করে দিয়েছিলেন। তাই বংশীর উত্তরণে তার মনে কোন দোলাচলতার সৃষ্টি হয় না। বাপ্পার জন্য বংশীকে অনুরোধ জানাতেও তার অসম্মানবোধে আঘাত হয় না। কিন্তু বংশীর প্রতি এই মমত্ববোধ সকলের অগোচরে। এখানে তিনি অসহায়। আসলে মধ্যবিত্তরা নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে বুঝতে পারে না, তা হয় তো নয়, কিন্তু নিজেদের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে না বলেই ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে একই বৃত্তের আবর্তে। লেখক নিজেই বলেছেন—

> ‘‘আসলে মধ্যবিত্ত হল সমাজের মধ্যবৃত্ত। বংশানুক্রমে যারা একটি বিশাল নাগরদোলায় বসে আছে। কখনো ওপরে উঠছে কখনো নীচে নামছে, কিন্তু বৃত্তের বাইরে কদাপি নয়।’’[৪৭]

অতএব আলোচনার আপাত সমাপ্তিতে এসে আমরা বলতে পারি যে এযাবৎ আলোচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে মধ্যবিত্তের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে তার সঙ্গে আমরা যেন একাত্মতা অনুভব করতে পারছি। এ যেন আমাদের প্রতিদিনকার যাপনের প্রতিচ্ছবি। মধ্যবিত্তের প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সৎ ও পরিচ্ছন্ন থাকার তীব্র মানসিকতা, আবার মুহূর্তেই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অন্যায় ও অনৈতিকতাকেও অবলীলাক্রমে গ্রহণ করা—পরবর্তীতে চরম দ্বিধা ও সংকট কাটাতে না পেরে বিমূঢ় বিস্ময়, দহনকে সহ্য করা এ এক আশ্চর্য কূটাভাস। চাইছি না, কিন্তু আপাত সুখের জন্য মেনে নিচ্ছি— আর তাতেই ভেতরে ভেতরে গভীর দহন। ‘ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি’— এই তো সমকালীন যুগের মানসিকতা। প্রতিদিনের টুকরো টুকরো ভণ্ডামি কিন্তু বাহ্যিকরূপে নিজেকে স্বচ্ছ সুন্দরের প্রতিচ্ছবিতে মেলে ধরা...। প্রেম, হিংসা, প্রতিবাদ, লোভ, ধর্মাচরণ— সবেতেই মধ্যবর্তী অবস্থান। যদিও শুধু সমালোচনা নয়, মধ্যবিত্তকে বাদ দিয়েও সমাজকে ভাবা যায় না কারণ সমাজের বৃহত্তর অংশ তো এরাই। এইসমস্ত সূক্ষ্ম, মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো কথাকার রমাপদ চৌধুরী তাঁর কথাভূবনে নিপুণ শিল্পীর মতো তুলে ধরেছেন। ফুলবডি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেন আমরা নিজেদেরকেই প্রত্যক্ষ করি। এ আমাদের চিরপরিচিত সাতকাহন।

সূত্রনির্দেশ :

১। রমাপদ চৌধুরীর মুখোমুখি বিবেক চট্টোপাধ্যায়, উজাগর, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয়, ১৪২০, পৃ.২৮।

২। তদেব, পৃ. ২৯।

৩। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ মার্চ ২০০৩, পৃ. ১১।

৪। তদেব, পৃ. ১৪।

৫। তদেব, পৃ. ২০।

৬। তদেব, পৃ. ২১।

৭। ঋতংকর মুখোপাধ্যায়, খারিজ পর্বের উপন্যাস ঃ নাগরিক মধ্যবিত্তের পরিবর্তিত সংকট, উজাগর, একাদশ, প্রথম ও দ্বিতীয়, ১৪২০, পৃ. ৩৩১।

৮। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ মার্চ ২০০৩, পৃ.৫২-৫৩।

৯। তদেব, পৃ. ৪৬।

১০। তদেব, পৃ. ৪৭।

১১। তদেব, পৃ. ৬৬।

১২। তদেব, পৃ. ৮৩।

১৩। তদেব, পৃ. ১১৩।

১৪। তদেব, পৃ. ১১৬।

১৫। তদেব, পৃ. ১২০।

১৬। তদেব, পৃ. ৮৪।

১৭। তদেব, পৃ. ১০২।

১৮। তদেব, পৃ. ১২৭, ১২৮।

১৯। তদেব, পৃ. ১২৯।

২০। তদেব, পৃ. ১৪২।

২১। তদেব, পৃ. ১৪৮।

২২। তদেব, পৃ. ১৫২।

২৩। তদেব, পৃ. ১৫৩।

২৪। তদেব, পৃ. ১৫৭।

২৫। তদেব, পৃ. ১৬৭।

২৬। তদেব, পৃ. ১৭০।

২৭। তদেব, পৃ. ১৮৬।

২৮। তদেব, পৃ. ১৮৬।

২৯। Shoma Bhowmik, A Writeri's writer, উজাগর, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয়, পৃ. ৩৯৫।

৩০। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ মার্চ ২০০৩, পৃ. ৪৩৭।

৩১। তদেব, পৃ. ১৯০।

৩২। তদেব, পৃ. ১৯০।

৩৩। তদেব, পৃ. ১৯৫।

৩৪। তদেব, পৃ. ১৯৭।

৩৫। তদেব, পৃ.২৫৫।

৩৬। তদেব, পৃ. ২১৭।

৩৭। তদেব, পৃ. ২৩২।

৩৮। তদেব, পৃ. ২৩৮।

৩৯। তদেব, পৃ. ২২৪।

৪০। তদেব, পৃ. ২২৪।

৪১। তদেব, পৃ. ২৪৫।

৪২। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৭, পৃ. ৩১৯।

৪৩। সুদীপ্ত চন্দ চৌধুরী, মানুষ ও লেখক রমাপদ চৌধুরী, উজাগর, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয়, পৃ. ৩২।

৪৪। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৭, পৃ. ৩২৮।

৪৫। তদেব, পৃ. ৩৫২।

৪৬। তদেব, পৃ. ৩৬১।

৪৭। তদেব, পৃ. ৩৬২।

৪৮। রমাপদ চৌধুরী, আমরা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১১।